কুরআন হাদীসের শুধু তরজমা পড়ে আমল করা গোমরাহী;
বরং আমল করতে হবে কুরআন-হাদীসের সর্বশেষ নির্দেশ তথা ‘সুন্নাহ’র উপর

পাঠক, এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে। বর্তমানে অনেকে সুন্নাহর ওপর চলার দাবি করেন কিন্তু সঠিক পদ্ধতি না জানার কারণে নিজেরাও গোমরাহ হচ্ছেন, অন্যকেও গোমরাহ করছেন।

এ বিষয়ে প্রথম নিবেদন হলো, দীন-ইসলামের বিধান একদিনে পূর্ণতা লাভ করেনি; বরং তা দীর্ঘ তেইশ বছরে পূর্ণতা এবং সার্বজনীনতা লাভ করেছে। একেকটি বিধান পর্যায়ক্রমে একাধিকবার নাযিল হয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে। উম্মতের জন্য আমলযোগ্য হলো কুরআন-সুন্নাহর সর্বশেষ হুকুম। আর আমলযোগ্য এ সর্বশেষ হুকুমকেই ‘সুন্নাহ’ বলা হয়ে থাকে। শুরু যামানার বিধানগুলো- যা পরবর্তী সময়ে রহিত হয়ে গেছে, সে সব বিধানগুলো ‘হাদীস’ হলেও তা সুন্নাহ তথা আমলযোগ্য নয়।

হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের তেইশ বছরের যিন্দেগীর সকল ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে। সুন্নাহ তথা সর্বশেষ নাযিলকৃত বিধি-বিধান যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে রহিত হয়ে যাওয়া প্রাথমিক যুগের বিভিন্ন ‘হাদীস’। বিজ্ঞ আলেম ব্যতীত সাধারণ মানুষের পক্ষে সুন্নাহ ও হাদীসের মাঝে পার্থক্য করা সম্ভব নয়। এ কারণেই কেউ যদি শুধু অনুবাদ নির্ভর হয়ে আমল করতে চায়, তবে সে নিঃসন্দেহে গোমরাহীর সম্মুখীন হবে। আমাদের অনেক ভাই জুমু‘আর দিন মসজিদে এসে খুতবা চলা অবস্থায় নামায পড়া আরম্ভ করে। মনে হয় যেন খতীব সাহেবের সাথে মোকাবেলা করতে এসেছে। মূলত তারা কুরআন হাদীসের অনুবাদ পড়ে আমল করে। উলামায়ে কিরামের নিকট জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনবোধ করে না। কুরআন হাদীসে থাকলেই আমল করতে হবে এই চিন্তাটাই গলত; বরং আমল করতে হবে কুরআন-হাদীসের সর্বশেষ বিধান তথা সুন্নাহর উপর। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুরআনের একাধিক আয়াত এবং হাদীসের কিতাব হতে বেশ কয়েকটি হুকুম উল্লেখ করবো, যে হুকুম-আহকাম প্রাথমিক যামানায় থাকলেও পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে যাওয়ায় এখন উম্মতের জন্য তা আমলযোগ্য নয় এবং এ কারণেই কেবল কুরআনের আয়াতের অনুবাদ পড়ে যেমন আমল করা বৈধ নয়, তেমনি শুধু হাদীসের তরজমা পাঠ করে আমল করাও জায়েয নয়।

শুধু কুরআনের আয়াতের অনুবাদ পড়ে আমল করা বৈধ নয়

কুরআনের এমন অনেক আয়াত রয়েছে, যা নামাযে তিলাওয়াত করা হয়, তারাবীহতে যা তিলাওয়াত না করলে খতম পূর্ণ হয় না। এতদসত্ত্বেও সে আয়াতে উল্লিখিত বিধানাবলী রহিত হয়ে যাওয়ায় তার উপর আমল করা উম্মতের জন্য জায়েয নয়।

প্রথম আয়াত : আল্লাহ তা‘আলা সূরা বাকারার ১৮০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

অর্থ: আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের ওপর ফরয করে দিয়েছেন যে, যখন তোমাদের কারো মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, আর তার ধন-সম্পদও থেকে থাকে, তাহলে সে তার মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসিয়্যাত করে যাবে। মুত্তাকীনদের জন্য এটি অবশ্য করণীয়।

অথচ এ আয়াতের উপর আমল করা হারাম সূরা নিসার ১১ নম্বর আয়াত দ্বারা মানসূখ তথা রহিত হয়ে গেছে।

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

উক্ত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলা সকলের অংশ খুলে খুলে বর্ণনা করে দিয়েছেন। আয়াতদ্বয় নাযিল হওয়ার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, এখন থেকে নির্ধারিত অংশের হকদারদের জন্য ওসিয়্যত বৈধ নয়।

দ্বিতীয় আয়াত: আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ২৪০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থ: 'তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু হয়ে যায় এবং স্ত্রী রেখে যায়, তারা যেন (মৃত্যুকালে) স্ত্রীদের অনুকূলে ওসিয়্যত করে যায় যে, তারা এক বছর পর্যন্ত (পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে খোরপোষ গ্রহণের) সুবিধা ভোগ করবে এবং তাদেরকে (স্বামীগৃহ থেকে) বের করা যাবে না। হ্যাঁ, তারা নিজেরাই যদি বের হয়ে যায়, তবে নিজেদের ব্যাপারে তারা বিধিমত যা করবে, তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। আল্লাহ মহা ক্ষমতাবান, প্রজ্ঞাময়।''

উক্ত আয়াতে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে এক বছর ইদ্দত পালন করতে বলা হয়েছে। অথচ এই হুকুমকে রহিত করে পরবর্তীতে নাযিল হয়েছে, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

অর্থ: 'তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায় ও স্ত্রী রেখে যায়, তাদের স্ত্রীগণ নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় রাখবে'।

হাদীস শরীফের ন্যায় কুরআন পাকের আয়াতসমূহও অবতীর্ণ হওয়ার সময়ের পূর্বাপরের প্রতি লক্ষ্য রেখে সাজানো হয়নি। অতএব শুধু কুরআনের অনুবাদ পড়ে আমল করা নিশ্চিত গোমরাহী।

তৃতীয় আয়াত: প্রথমে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রোযার বিধান এসেছে শিথিলভাবে। যাদের সুবহে সাদিকের পূর্বে সাহরী খেয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানাপিনা এবং গুনাহ বর্জনের হিম্মত হয় তারা রোযা রাখবে। হিম্মত না হলে না রাখারও সুযোগ ছিলো। প্রতি রোযার বদলে একজন ফকীরকে দুবেলা খাওয়ালে বা এর মূল্য দিয়ে দিলে রোযা আদায় হয়ে যেতো।

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

অর্থ: যারা রোযা রাখার সামর্থ্য রাখে, তারা একজন মিসকিনকে খানা খাইয়ে (রোযার) ফিদিয়া আদায় করতে পারবে।

রোযার এ প্রাথমিক বিধানের সময় অনেকেই রমাযানে হিম্মত করে রোযা রাখতেন আর কোন কোন সাহাবী ফকীরকে দু'বেলা খাওয়াতেন। তবে তারাও নিজেদের পিতা মাতা, ভাই বোন, বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনের রোযা রাখা দেখে বুঝতে পারলেন যে, সারাদিন খানা-পিনা ইত্যাদি থেকে বিরত থেকে রোযা রাখা সম্ভব, এবং আগামীতে রোযা রাখার নিয়ত করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

অর্থ: এখন থেকে তোমাদের মধ্যে সামর্থ্যবান ব্যক্তি রমযান মাস পেলে অবশ্যই রোযা রাখবে।

সামর্থ্যবানদের রোযা না রেখে ফকীরকে খানা খাওয়ানোর বিধান রহিত হয়ে গেলো। এ হুকুম শুধুমাত্র অতিশয় বৃদ্ধ, মুমূর্ষু রোগীদের জন্য বহাল থাকলো। তারা প্রতিটি রোযার বদলে একজন ফকীরকে দু'বেলা খানা খাওয়াবে বা একটি সদকায়ে ফিতর পরিমাণ মূল্য দিয়ে দিবে।

হাদীসের বর্ণনাসমূহের তরজমা পড়ে আমল করাও বৈধ নয়

দৃষ্টান্ত এক : নামায প্রসঙ্গ

মি'রাজের রাত্রে আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে কয়েকটি জিনিস হাদিয়া দিলেন। প্রথম হাদিয়া : শিরকমুক্ত ঈমান নিয়ে কবরে আসার ওপর জান্নাতের ওয়াদা। আল্লাহ তা'আলার নিকট শিরকযুক্ত ঈমানের কোন মূল্য নেই। শিরকের উদাহরণ হলো, মাযারে প্রার্থনা করা, সিজদা করা, মাযার তাওয়াফ করা ইত্যাদি। মাযার কেন্দ্রিক যা কিছু হয় প্রত্যেকটা ঈমান বিধ্বংসী।

বর্তমানে এনজিও, খ্রিস্টান মিশনারিগুলো অনেক ভালো ভালো কাজ করছে, বাড়ি বাড়ি টয়লেট বানিয়ে দিচ্ছে, বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল বানিয়ে দিচ্ছে, টিউবওয়েল বসিয়ে দিচ্ছে ইত্যাদি। এসবের কোন বিনিময় তারা আল্লাহর কাছে পাবে না। কেননা, তাদের ঈমান নেই। ইয়াহু-দী ধর্ম খ্রিস্টধর্ম এক সময় ঠিক ছিলো। কিন্তু কালপরিক্রমায় তা সম্পূর্ণরূপে

বিকৃত হয়ে গেছে। উপরন্তু কুরআন নাযিল হওয়ার পর সব রহিত হয়ে গেছে। মুক্তির একমাত্র পথ ইসলাম কুরআন ও প্রিয় নবীর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত।

মি’রাজের দ্বিতীয় হাদিয়া: নামায। নামায প্রথমে দুই ওয়াক্ত ছিলো। মি’রাজের রাতে আল্লাহ তা‘আলা পঞ্চাশ ওয়াক্ত করে দিলেন। ফেরার পথে হযরত মূসা আ. এর অনুরোধে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরিয়াদ করায় আল্লাহ তা‘আলা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত বাকী রাখলেন এবং ইরশাদ করলেন, আপনার দরখাস্তের প্রেক্ষিতে যদিও আমি পাঁচ ওয়াক্ত করে দিয়েছি কিন্তু এই পাঁচ ওয়াক্তের বিনিময়ে আপনার উম্মতকে পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই সওয়াব দান করবো। আমার পবিত্র কালাম কখনো পরিবর্তন হয় না। مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ।

মি’রাজের দ্বিতীয় হাদিয়া নামাযের এ বিধান ধাপে ধাপে পূর্ণ হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধান-প্রাথমিক সময়ে জায়েয ছিলো- পরবর্তীতে তা নাজায়েয করে দেওয়া হয়েছে। যেমনঃ

১. এক সময় নামাযে কথা বলা জায়েয ছিলো। একবারের ঘটনা, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম চার রাকা‘আত বিশিষ্ট নামায দুই রাকা‘আত পড়িয়ে সালাম ফেরালেন। এবং সামনে বেড়ে মুসল্লীদের দিকে মুখ করে বসলেন। জামা‘আতে হযরত আবু বকর রাযি. উমর রাযি. এর মত বড় বড় সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। ভয়ে কারো কিছু বলার সাহস হলো না। যে যত বেশি বড়দের নিকটবর্তী হয় সে তত বেশি ভয় পায় যাতে কোন ধরণের বেয়াদবী না হয়ে যায়। মজলিসে একজন সাহাবী ছিলেন। দাঁড়ালে হাত হাটু পর্যন্ত পৌঁছুত। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যূলইয়াদাইন বলে ডাকতেন। তিনি সাহস করে বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায কি আল্লাহর পক্ষ থেকে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে না কি আপনি ভুলে গেছেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, لم يكن كل ذلك দু’টির কোনটিই হয়নি। আল্লাহ তা‘আলাও কমাননি, আমার জানা মতে আমিও ভুল করিনি। যূলইয়াদাইন রাযি. বললেন, কিছু না কিছু অবশ্যই হয়েছে ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘটনা যাচাইয়ের জন্য হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলে তারা ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলেন, জি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায দুই রাকা‘আত পড়ানো হয়েছে। এসব কথা বার্তার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার দুই রাকা‘আত পড়িয়ে সাহু সিজদা করলেন।

এই হাদীস দেখে যদি বর্তমানে কোন ইমাম সাহেব দুই রাকা‘আত পড়িয়ে কথাবার্তার পর বাকী দুই রাকা‘আত পড়ে সাহু সিজদা করে তাহলে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। অথচ ইমাম সাহেব বাহ্যিকভাবে বুখারী শরীফের ওপর আমল করেছেন। বোঝা গেল কুরআন শরীফে থাকলেই কিংবা বুখারী শরীফে থাকলেই আমল করা যাবে না। দেখতে হবে এব্যাপারে একটিই হাদীস বর্ণিত হয়েছে নাকি একাধিক হাদীস। একাধিক হাদীস থাকলে প্রথম হাদীসটি রহিত। শুধু শেষ হাদীসটি আমলযোগ্য। হাদীসের বিশাল ভান্ডারে রহিত হাদীসগুলোও লিপিবদ্ধ আছে। বিষয়টি না জানার কারণে অনেকে বুখারী শরীফে পেলেই আমল শুরু করে দেয়।

২. মদীনায় হিজরতের পূর্ববর্তী সময়ে নামাযে রফয়ে’ ইয়াদাইন করার (বার বার হাত তোলার) অনুমতি ছিলো। কারণ ৩৬০ খোদার কথা মনে হত। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব চিন্তা দূর করার জন্য বার বার হাত তোলার পদ্ধতি শেখালেন। ঈমান মজবুত হয়ে যাওয়ার পর নিষেধ করে দিলেন। রফয়ে ইয়াদাইনের পক্ষে এবং বিপক্ষে উভয় হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.। মক্কায় রফয়ে ইয়াদাইন করার এবং মদীনায় না করার হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এর একাধিক শাগরেদ বর্ণনা করেন, আমাদের উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. নামাযের শুরুতে একবার ব্যতীত আর কোন স্থানে হাত ওঠাতেন না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে তাঁর শাগরেদদের মাধ্যমে যবানী এবং আমলী উভয় বর্ণনা দ্বারা রফয়ে ইয়াদাইন না করা প্রমাণিত। রফয়ে ইয়াদাইন এক সময় জায়েয থাকলেও পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে।

৩. এক যামানায় ইমাম বসে নামায পড়ালে মুক্তাদির জন্যও বসে ইক্তিদা করার হুকুম ছিলো। উযর থাক বা না থাক। পরবর্তীতে এ হুকুম রহিত হয়ে গেছে। এখন ইমাম উযরের কারণে বসে নামায পড়ালে মুক্তাদি বিনা উযরে বসে ইক্তিদা করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুধবার থেকে সোমবার পর্যন্ত অসুস্থ থাকার পর ১লা রবিউল আউয়ালে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের বছর ১২ই রবিউল আউয়াল কোনভাবেই সোমবার পড়ে না। সমাজে ভুলটাই বেশি প্রসিদ্ধ। এই অসুস্থ অবস্থায় একদিন তিনি দু’জনের কাঁধে ভর দিয়ে যোহরের সময় মসজিদে তাশরীফ এনে বসে নামায পড়ালেন। আওয়াজ এত ক্ষীণ ছিলো যে, হযরত আবু বকর রাযি. কে মুকাব্বির বানিয়ে নিজের সাথে দাঁড় করালেন। বাকী সাহাবীরা পিছনে দাঁড়িয়ে ইক্তিদা করলেন। এই হাদীস দ্বারা বোঝা গেল পূর্বের হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

দৃষ্টান্ত দুই: মদ নিষিদ্ধতা প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা‘আলা মদকে কয়েক ধাপে নিষেধ করেছেন। প্রথমে মদের ক্ষতির কথা বর্ণনা করেছেন। এরপর নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাযে আসতে নিষেধ করেছেন। নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামায পড়লে কিরাআতে ভুল হতে পারে। এভাবে কয়েক ধাপের পর এক পর্যায়ে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থ: হে মু‘মিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি এবং লটারির তীর, এসব গর্হিত বিষয় শয়তানী কাজ ছাড়া আর কিছুই না; সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

প্রথমদিনই মদ নিষিদ্ধ করলে আমল করা কষ্টকর হত। এই জন্য দিল তৈরি করার পর আল্লাহ তা‘আলা মদ হারাম করলেন। তখন আমল করতে বিন্দুমাত্রও দেরি হয়নি।

এই আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজনকে মদীনার অলিতে গলিতে আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আয়াত শোনার সাথে সাথে যারা মদ পান করছিলো গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করে ফেললো। যাদের ঘরে মদ ছিলো তারা পাত্র ভেঙ্গে ফেললো। ব্যবসায়ীরা মদের মশকগুলো (চামড়ার পাত্র যেগুলোতে মদ ছিলো) চাকু দিয়ে ফেড়ে দিলো। ফলে রাস্তা ঘাট মদের বন্যায় ভেসে গেলো। দিল তৈরি হওয়ার কারণে এমন অভূতপূর্ব দৃশ্য সৃষ্টি হয়েছিলো।

সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম প্রথমে উম্মতের দিল তৈরি করেছেন। তখন উম্মতের নামায-রোযা সহ অন্যান্য সকল আমল ঠিক হয়ে গেছে।

হাদীসের কিতাবাদিতে সাহাবায়ে কেরামের মদ পান করার ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সে বর্ণনাগুলো কেবল হাদীস, সুন্নাত তথা উম্মতের জন্য আমলযোগ্য নয়; বরং আমলযোগ্য হলো এ ব্যাপারে সর্বশেষ হুকুম তথা মদ হারাম।

সারকথা, কুরআন-সুন্নাহর বিধানাবলী তেইশ বছরের নবুওয়্যাতী যিন্দেগীতে এভাবেই ধাপে ধাপে পূর্ণতা লাভ করেছে। সর্বশেষ বিদায় হজ্জে আল্লাহ তা‘আলা আয়াত নাযিল করলেন,الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থ: আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে এবং তোমাদের ওপর আমার নে‘আমতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। আর আমি একমাত্র ইসলামের ওপর রাযি হয়ে গেলাম।

এখন উম্মতের জন্য আমলযোগ্য হলো, কুরআন-সুন্নাহর সর্বশেষ হুকুম তথা সুন্নাত। আর কুরআন-হাদীসের যে সকল বিষয় কেবল প্রাথমিক পর্যায়ে ছিলো, অর্থাৎ যা পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে, সে সকল বিধানাবলী সুন্নাত তথা উম্মতের জন্য আমলযোগ্য নয়। রহিত হয়ে যাওয়া সে বিধানাবলী কুরআন হাদীস থেকে পাঠ করলে সওয়াব হবে, কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করলে সওয়াবের পরিবর্তে মারাত্মক গুনাহ হবে।

একটি যুক্তিনির্ভর উদাহরণ

ডাক্তার রোগীর অবস্থাভেদে প্রথমবার এক ঔষধ, দ্বিতীয়বার ভিন্ন ঔষধ, তৃতীয়বার পরিবর্তন করে নতুন ঔষধ লেখে। প্রথম দুই প্রকারের ঔষধ ভুল ছিলো না। তখন সেটাই ঠিক ছিলো। কিন্তু তৃতীয়বার প্রেসক্রিপশনের পরও রোগী পূর্বের ঔষধ খেতে থাকলে সুস্থতার পরিবর্তে অসুস্থতাই বাড়তে থাকবে। তদ্রুপ আল্লাহ তা'আলা বান্দার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সময়ে সময়ে হুকুম আহকাম পরিবর্তন করেছেন। শেষ হুকুম নাযিল হওয়ার পরও কোন ব্যক্তি পূর্বের হুকুম মানতে থাকলে তার আমল বাতিল বলে গণ্য হবে।

মোটকথা দীনের বিধি-বিধানগুলো ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে চূড়ান্ত হয়েছে। সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত হুকুমকে সুন্নাত বলা হয়। এ ধরণের সুন্নাতই আমলযোগ্য। আর শুরু যামানার রহিত হুকুমগুলোকে শুধুই হাদীস বলা হয়। সুন্নাত বলা হয় না। বর্তমানে এসকল হাদীসের উপর আমল করা নাজায়েয। হাদীসের কিতাবসমূহে নবুওয়্যতের তেইশ বছরের সকল আমলই উল্লেখ করা হয়েছে। অমুক আমলের ব্যাপারে এটি প্রথম, এটি শেষ এভাবে সুবিন্যস্ত করে হাদীস ও সুন্নাতের মাঝে পার্থক্য হাদীসের কিতাবাদিতে করা হয়নি। কাজেই সাধারণ পাঠকদের জন্য 'হুকুম-আহকাম' সম্বলিত হাদীসের গ্রন্থাবলী যেমন: বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি পাঠ করা উচিত নয়; বরং তাদের উচিত 'ফাযায়েল সম্বলিত' হাদীসের গ্রন্থাবলী যেমন ফাযায়েলে আমল ইত্যাদি পাঠ করা, আর আমলের ক্ষেত্রে হক্কানী উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্তের উপর আস্থা রাখা। এর বিপরীতে তারা যদি হক্কানী উলামায়ে কেরামের উপর আস্থা হারিয়ে আমলের জন্য হাদীসের কিতাবাদির অনুবাদের উপর নির্ভর করতে শুরু করেন, তবে এর দ্বারা তারা নিজেরা যেমন গোমরাহ হবেন, তেমনি সমাজের মধ্যেও গোমরাহী আর ভ্রষ্টতার সূত্রপাত ঘটাতে সক্ষম হবেন।

বর্তমানের আহলে হাদীস ভাইদের অবস্থা

আমাদের কিছু ভাই কেবল বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফের বাংলা অনুবাদ দেখে আমল করে। তাদের 'ইসলাম রিসার্চ' কেবল অনুবাদ নির্ভর হওয়ায় তারা নিজেরা যেমন গোমরাহ হয়, তেমনি অন্যদেরকেও গোমরাহ করে। শুধু তাই নয়; কিছু ভাই তো 'অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর' এ প্রবাদ ভুলে গিয়ে মসজিদে এসে রীতিমত ইমাম সাহেবানদের সাথে তর্ক জুড়ে দিতেও কুণ্ঠিত হন না। এটা যে, কত বড় অনাধিকার চর্চা, তা তারা একবারও ভেবে দেখার প্রয়োজন মনে করেন না। এ ভাইদের মধ্যে যাদেরকে কিছুটা 'ইলমধারী' মনে করা হয়, তারা হাদীসের অপব্যাখ্যা করতে ঠিক ততটা পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়ে থাকেন।

তাদের হাদীসের ভুল ব্যাখ্যার একটি দৃষ্টান্ত হলো, হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা কাতারে দাঁড়ানোর সময় পা মিলিয়ে দাঁড়াবে'। মিলানোর অর্থ হলো কাতার সোজা রাখা, পা আগে পিছে না করা। আহলে হাদীস ভাইয়েরা অর্থ করে, একজনের পা অন্যের সাথে মিলিয়ে দাঁড়ানো। এটা সম্পূর্ণ ভুল। আবূ দাউদ শরীফের এক হাদীসে আছে, 'তোমরা নামাযের কাতারে দু'জনের পায়ের মাঝে জুতা রাখবে না। সেখানে ফেরেশতারা দাঁড়ায়'। আহলে হাদীস ভাইদের ব্যাখ্যা মানা হলে দু'জনের মাঝে জুতা রাখার জায়গাও থাকে না, কাতারে ফেরেশতাদের দাঁড়ানোর ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদও ঠিক থাকে না। মূলত তারা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য ইংরেজদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করছে।

অধিকাংশ আহলে হাদীস ভাই আরবী বুখারী শরীফ দেখেইনি; অনুবাদই তাদের সম্বল। নাসেখ মানসূখের (হাদীস রহিত হওয়া-বহাল থাকার) বিষয়টি হয়ত কখনো শোনেইনি। তাদের ধারণা অনুযায়ী উলামায়ে কেরাম কুরআন-হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ। একমাত্র তারাই সহীহ হাদীসের উপর আমলকারী। এগুলো ইংরেজদের তৈরি ফিতনা। শুরুতে গাইরে মুকাল্লিদ নামে প্রসিদ্ধ ছিলো। মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী ইংরেজ গভর্নরের নিকট আবেদন করে 'আহলে হাদীস' নাম মঞ্জুর করেছিলো। মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী ফাতওয়া দিয়েছিলো, 'ভারতবর্ষের জন্য ইংরেজ সরকার খোদার রহমত এবং এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হারাম'। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ 'মাযহাব ও তাকলীদ' নামক বইয়ে আমি লিখেছি।

সারকথা, কুরআন-হাদীসের উপর আমল করার পদ্ধতি হলো, ‘সুন্নাহ’ তথা সর্বশেষ নাযিলকৃত হুকুমের উপর আমল করা। এ পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে কেবল অনুবাদ নির্ভর জ্ঞান অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার কারণ।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সবাইকে হিফাযত করুন এবং সহীহ সুন্নাতের ওপর আমল করার তাউফীক দান করুন। আমীন।